ওঁর জন্য দেশে ফেরাই হল না

নিবারণ সাহা

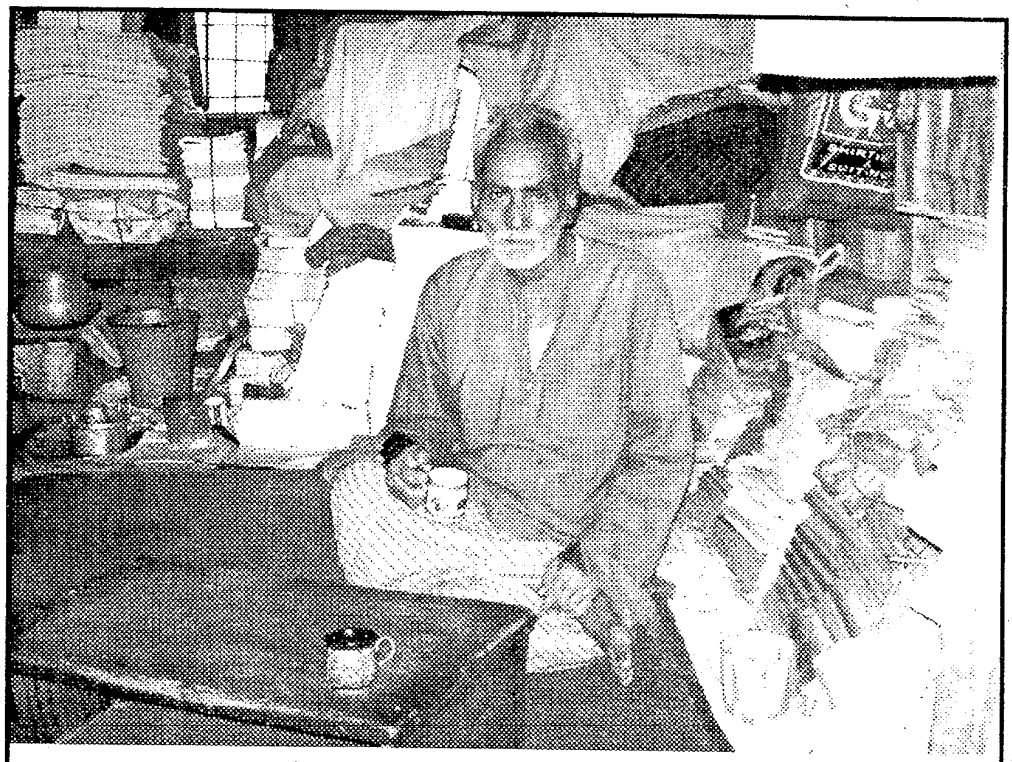

নিবারণদার বাঁধাইঘর। উৎস মানুষের আঁতুড়ঘর

আমি আর পবন তখন বিড়লা টেকনোলজিক্যাল অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিউজিয়ামে। অশোকবাবু যোগ দিলেন, সেকসন ইন-চার্জ হয়ে। ক্যান্টিনে খেতে খেতে পবনের সঙ্গে প্রায়ই আলোচনা করতেন একটা পত্রিকা প্রকাশের। আমি কতদূর কী সাহায্য করতে পারি, কোথায় ছাপা হবে, বসা হবে, জানতে চাইলেন। শেষমেশ পত্রিকা বের করেই ছাড়লেন। আমিও ঢুকে পড়লাম উৎস মানুষ পরিবারে। আমার অপরিসর ঘরেই হল বসবার জায়গা। প্রথম সংখ্যা হাওড়ায় ট্রেডল্ মেসিনে ৫০০ কপি ছেপে ঘাড়ে করে নিয়ে এসেছিলাম। পয়সার অভাবে একদিকের কভার ছাপা হত। ক্রমে আমার ঘরকে ঘিরেই বেড়ে উঠছিল পত্রিকা। অত উঁচু পদে কাজ করতেন, কিন্তু আমার মতো মানুষের সঙ্গেও মিশতেন সহজভাবে। কোনও অহঙ্কার ছিল না। শুধু মুখে আলোচনা চলে না। চাই মুড়ি, চা। একটা টিনের কৌটোই কিনে দিলেন মুড়ি মজুতের জন্য। সন্ধেবেলা কাজে ব্যাঘাত ঘটত। তাই আমার এক কর্মী গৌরীকে, অশোকবাবুরা বৌদি বলত, কিছু টাকা দিতেন। এমনকি গৌরীর মেয়ের পড়াশোনার জন্য মাধ্যমিক পর্যন্ত অর্থ সাহায্য করেছেন অশোকবাবু। 'উৎস মানুষ' রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট ও মহাত্মা গান্ধী রোডের অফিসে চলে যায়। পত্রিকা ও বই বাঁধাই আমিই করতাম। ঠিক কেন জানি না, শেষের দিকে সেই কাজ পাইনি। কিন্তু আমাদের সম্পর্কে কোনো তিক্ততা হয়নি। অশোকবাবুর মারা যাওয়ার খবরে মনটা ভারী হয়ে গেল। হারানো সব কথা ভিড় করতে লাগল মনে। ৯৪ সালে চাকরি থেকে অবসর নিয়ে ঠিক করেছিলাম দেশে ফিরে যাব। অশোকবাবু বললেন, 'উৎস মানুষ' ছেড়ে যাবেন কোথায়? সেখানে গিয়ে কী করবেন! অসুখ হলে ভাল ডাক্তারও পাবেন না!

সত্যিই এখানে নিখরচায় ডাক্তারের ব্যবস্থা করে দিলেন। ছেলের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিলেন। ধরিয়ে দিলেন মানব মন-এর কাজ। ওঁর বিয়েতে গিয়ে সবাই কত হৈ চৈ করেছি। খাওয়ার পর পান খেতেন। আমাকে সেজে দিতেন নিজের হাতে। প্রতিটি বইতে আমার নাম ছাপিয়ে যে সম্মান দেখিয়েছেন, তা কোথাও পাইনি। ওঁর জন্য দেশে যাওয়া হল না। আশায় ছিলাম, আবার হয়তো অশোকবাবুরা আমার ঘরে ফিরে আসবেন। আগের মতোই মেতে উঠবেন তর্কে, আলোচনায় সেই মুড়ির টিন এখনও যত্নে রাখা আছে। সব রইল, শুধু চলে গেলেন আমার প্রিয়জন অশোকবাবু।

কেমন আছেন ? বহুদিন পর !

মধুসূদন দত্ত

নন্দীগ্রাম পরবর্তী পর্যায়ে বিবেকের দংশনে একটা লেখা রবীনদাকে (চক্রবর্তী) পাঠিয়েছিলাম। রবীনদা ওটা অশোকদাকে দেখতে দিলেন এবং আমাকে সে কথা বললেন।

অশোকদার সঙ্গে দীর্ঘদিন যোগাযোগ ছিল না। রবীনদাকে লিখলাম, লেখাটা সম্ভবত অন্য কোথাও পাঠাতে হবে, কারণ 'উৎস মানুষ' সামাজিক-রাজনৈতিক লেখা ছাপে না। প্রায় পঁচিশ বছর আগে এ নিয়ে অশোকদার সঙ্গে আমি, স্মরজিৎ ও আরও কেউ কেউ বিস্তর আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক করেছি। অনেক মতভেদ ছিল, যদিও আমাদের বন্ধুত্ব এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ অটুট ছিল। অশোকদা সাধারণত বিজ্ঞানভিত্তিক না হলে লেখা ছাপতে চাইতেন না।

অশোকদার ই-মেল ঠিকানা পেয়েই চিঠি লিখলাম। "কেমন আছেন, অনেক দিন পর সন্ধান পেয়ে যোগাযোগের লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম।"- মধু।

পরের দিনই (জুলাই, ১৪, ২০০৮) পনের-ষোল লাইনের আবেগঘন চিঠি। স্মরণ করিয়ে দিলেন "তোমাকে আমি মাইকেল বলে জানি।" (এ নাম অশোকদারই দেওয়া) জানালেন আমার লেখা শুনেই চেয়ে নিয়েছেন পড়বেন বলে। দুঃখ করে জানালেন অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর দূরত্বের কথা, কারও নাম না করেই। লিখলেন "আমাদের ভালো বন্ধুরা আমাকে পছন্দ করে না।" নিজের শরীর সম্বন্ধে লিখলেন "...একটা কার্ডিয়াক ব্যাধি নিয়ে 'উৎস মানুষ' আর কত দিন চালাতে পারব জানি না।"

দুই বন্ধু বহুদিন যোগাযোগ-বিচ্ছিন্ন থাকায় বর্তমানে কে কী করছি এবং ভাবছি এ ব্যাপারে গভীর আগ্রহ দুজনকেই আবিষ্ট করেছিল। আমি লিখলাম - "বহুবছর পর সেই পুরনো অশোকদাকেই পেলাম। একটুও পাল্টাননি। (আমরা আগেও এমনই আন্তরিক ভাবেই কথা বলতাম।") লিখলাম আমাদের বন্ধুরা ভাল সন্দেহ নেই, নাহলে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বই হতো না। একসঙ্গে চলতে গিয়ে মতভেদ হয়েছে, ভুল বোঝাবুঝিও। পরস্পরের ব্যক্তিত্ব-অস্মিতার সংঘাত এসেছে, দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্বাস করি, যে কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে অনেক সময়ই অস্মিতাকে পরিত্যাগ করা যায় না। তাহলে লক্ষ্যকেই পরিত্যাগ করতে হয়। তাই অশোকদার কিছুটা একাকিত্বজনিত বেদনা সম্ভবত অপরিহার্য। লিখলাম পত্রিকা যদি বন্ধ হয়ই, হা-হুতাশ করে লাভ নেই। কত আপনার জনকেও তো আমাদের হারাতে হয়। তবু অশোকদা যেন শরীরের যত্ন নেন।

এখন মনে হয় শেষ কথাটা আমি কী লিখলাম। আমি কি একজন মাকে উপদেশ দিলাম সন্তানকে ছেড়ে নিজের শরীরের যত্ন নিতে? একসঙ্গে দুটো ভুল করেছি। প্রথমত অশোকদার শরীর যে কতটা খারাপ ছিল তা আমি দূর থেকে আন্দাজ করতে পারি নি, উচিত ছিল আন্দাজ করা, কারণ আমি আগে জানতাম হার্টের অসুখের কথা। দ্বিতীয়ত অশোকদার কাছে 'উৎস মানুষ' যে নিজের হার্টের মতোই প্রয়োজনীয় ছিল তাও বুঝিনি। অশোকদা চিঠির উত্তরে ধন্যবাদ দিয়ে লিখলেন,

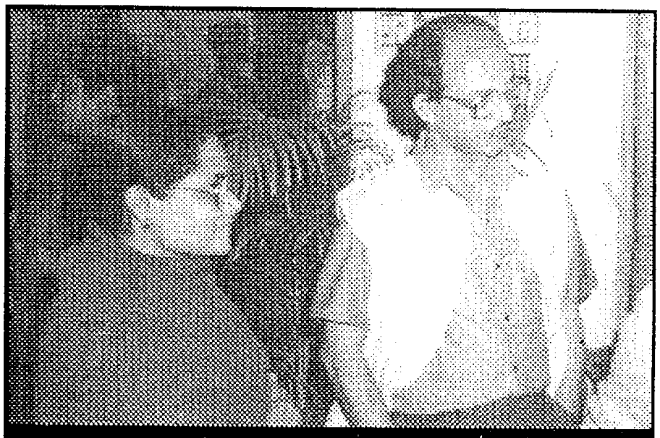

৯৪-এর বইমেলায় আলাপচারিতায়

আমার সঙ্গে একমত এবং উৎস মানুষ বন্ধ হয়ে গেলে তিনি মেনে নেবেন। আমাদের যোগাযোগ যাতে থাকে সে ব্যাপারেও আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তৃতীয় মেল এল ২৯ আগস্ট তারিখে। লিখলেন, আমার যে লেখাটা রবীনদার থেকে নিয়েছিলেন সেটা উৎস মানুষের ওয়েবসাইটে তুলে দিচ্ছেন, কারণ, দেরি হলে লেখাটা প্রাসঙ্গিকতা হারাবে। উৎস মানুষ কবে বেরবে ঠিক নেই, তাই দেরি করতে চাননি। রাজনীতি ঘেঁষা লেখা ছাপতে অশোকদার এত আগ্রহ আমি আশা করিনি। নন্দীগ্রাম এভাবেই আমাদের সকলকে নাড়া দিয়েছে। আরও লিখলেন, আমি যেন লেখা নিশ্চয়ই পাঠাই, তবে তা পড়ে দেখার অবসর পেতে অশোকদার সময় লাগতে পারে। কারণ, শারীরিক ও মানসিক চাপের কয়েক দিন পর চতুর্থ মেলটা এসেছিল - দু লাইনের। জানালেন ওয়েবসাইটে আমার লেখাটা উঠেছে, যেন দেখে নিই - সাইটের ঠিকানা দিলেন।

কয়েকদিন পরেই শুনলাম অশোকদা নার্সিংহোমে এবং আমি যে দেখা করব সে অবস্থায় নেই। মাত্র কয়েকদিন শেষ শয্যায় ছিলেন, আমার ভাইয়ের থেকে খবর পেতাম। দ্রুত সব শেষ। অশোকদার চিঠিগুলোতে বন্ধু-বিচ্ছিন্নতা-জনিত একাকিত্ব ও একটা অসহায়তা বোধ আমার মনকে বার বার নাড়া দিয়ে যেত। তা কখনো লিখিনি, কিন্তু এখন ভাবলে নিজেও খুব একাকী বোধ করি। ভাবি 'উৎস মানুষ'-এর সঙ্গে যুক্ত যে বন্ধুদের পেয়েছিলাম তাঁরা প্রত্যেকেই ছিল সৎ এবং নিঃস্বার্থ, নিষ্ঠাবান এবং কর্মঠ। 'উৎস মানুষ'কে সবাই ভালবাসত, তবু দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল। পরস্পরের প্রতি আকর্ষণও যে কতটা গভীর ছিল, তা কয়েকদিন পরেই টের পেলাম। একাকিত্বের যন্ত্রণা নিয়ে যে মানুষটা চলে গেল, তাঁর একাধিক স্মরণসভায় ভাল বন্ধুরা উপচে পড়ল ভালবাসা উজাড় করে দিতে। কারো চোখের জল দেখিনি, সে জল অন্তরকে বিগলিত করেছিল।

দরকার এফ ডি

যুগলকান্তি রায়

অশোকবাবুকে নিয়ে বিশেষ সংখ্যায় লিখতে বসে আজ একটি কথাই মনে পড়ছে। কথাটি হলো 'এফ ডি'। কথাটি অশোকবাবু ও আরো দু-একজনের কাছে শোনা। 'উৎস মানুষ'-এর পত্তনই হয়েছিল একটি পরিবারের কথা ভেবে যে পরিবারের নামও হবে 'উৎস মানুষ'। পরিবারের সদস্যরা নানা নিয়ম নীতির মধ্যে একটি কঠিন নীতি বা শর্ত ঠিক করেছিলেন। সেই নীতিটি হল, আলোচনায় যখন বসা হবে যার যা মনে হবে খোলাখুলি বলতে হবে - ফিসফিসানি নয়, কানাকানি নয় অর্থাৎ খোলামেলা কথাবার্তা চাই। ইংরাজি বয়ানে যাকে বলা হল ফ্র্যাঙ্ক ডিসকাসন বা এফ ডি। এ যেন 'উৎস মানুষ'-এর কোড ল্যাংগুয়েজ-যা উৎস মানুষকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছিল।

কথাটি খুব হাল্কা, খুব তুচ্ছ মনে হলেও এর গুরুত্ব অনেক। যখনই যেখানে ঐ এফ ডি তে ভাঙন এসেছে, তখনি ভেঙেছে সম্পর্ক, বেড়েছে ফিসফিসানি। এই এফ ডি-র অভাব অশোকবাবুকেও খুব পীড়া দিত। বইচিত্র ও স্টুডেন্টস হলে অশোকবাবুর স্মরণ সভায় যে বন্ধুসমাগম হয়েছিল তা দেখে আমার বার বার মনে হয়েছে ঐ সমাগমের সিকিভাগের সিকিভাগও যদি এফ ডি-র বাঁধন মেনে একজোট হতেন বা হতে পারতেন, তাহলে একরকম নিঃসঙ্গ অবস্থায় অশোকবাবুকে 'উৎস মানুষ' নিয়ে কাটাতে হত না। তা যে হয়নি, তা কি অশোকবাবুর 'ব্যর্থতা' নাকি সামগ্রিক বিজ্ঞান আন্দোলনের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা? এই প্রশ্নের বিচার-বিশ্লেষণ বিজ্ঞান আন্দোলনের স্বার্থেই করা দরকার। কেননা, এফ ডি যে এখন একেবারে উধাও।

কীভাবে বহন করব তার বোঝা!

সৌমিত্র শ্রীমানী

১৯৭৯-এ আকাশবাণী কলকাতার 'যুববাণী' অনুষ্ঠানে শালগ্রামশিলার বিজ্ঞান রহস্য বিষয়ে একটি আলোচনা করতে আগ্রহী ছিলেন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। কর্তৃপক্ষ অনুমতি দেয় নি। যুক্তি ছিল, ধর্মবিশ্বাসে আঘাত লাগতে পারে। অশোকের প্রচেষ্টা ফলবতী হল না। অশোক কিন্তু থামবার পাত্র ছিলেন না। তখন 'মাটির কাছে' নামে এক পত্রিকার সঙ্গে তিনি যুক্ত। চেষ্টা করলেন সেই পত্রিকার মাধ্যমে, যুক্তিবাদী মনন গড়ে তোলার। কিন্তু সেটাও সম্ভব হল না।

কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে স্থির হল, নিজস্ব এক মাধ্যম না থাকলে যা চাই, তা করা সম্ভব নয়। কোনোরকম রাজনৈতিক ভাবাদর্শকে প্রশ্রয় না দিয়ে, শুধুমাত্র মানুষের মনে জমে থাকা কুসংস্কার, ধর্মীয় অন্ধ বিশ্বাস-প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করব। প্রকাশিত হল 'মানুষ' অশোকেরই দেওয়া নাম। প্রচ্ছদও সংযোজন করার মতো অর্থ আমাদের ছিল না। একটা খালি কাগজের ওপর প্রচ্ছদ করে মুদ্রিত করে তা পত্রিকার শুরুর পৃষ্ঠায় আগে সংযোজিত করা হল। ঐ সংখ্যাতেই প্রকাশিত হল শালগ্রাম শিলার বিজ্ঞান রহস্য। সময়টা ১৯৮০-এর জানুয়ারি। অশোকের নেতৃত্বে আমরা কয়েকজন মাত্র। আমাদের সামনে জানুয়ারী মাসেই একটা বড় সুযোগ উপস্থিত হয়। কলিকাতা পুস্তক মেলা ঐ মাসের শেষ সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। আমরা প্রতিদিন মেলায় আমাদের পরিচিত যেসব লিটিল ম্যাগাজিন গোষ্ঠীর স্টল ছিল তাদের স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে সদ্যোজাত পত্রিকা ফেরি করেছিলাম। অশোকের উৎসাহ অফুরন্ত। তিনি অফিসের কাজ সেরে প্রতি সন্ধ্যায় আমাদের সঙ্গে যোগ দিতেন। প্রথম সংখ্যা থেকেই 'মানুষ' পত্রিকার যে জনপ্রিয়তা দেখা গেল তার থেকেই আমরা বুঝলাম যে অশোকের পরিকল্পনা তথা কুসংস্কারবিরোধী মানসিকতার গুরুত্ব কতখানি।

যতদূর মনে পড়ে, প্রথম সংখ্যা ছাপা হয়েছিল সম্ভবত ৩০০। এক বছর পরই তা হাজার অতিক্রম করে। একসময়ে সাড়ে পাঁচহাজারের গণ্ডীও অতিক্রম করেছিল। অশোকের ভূমিকা ভোলার নয়। দিনের পর দিন কাঁধের ঝোলায় ভরে পত্রিকা প্রকাশের দুই কি তিন দিনের মধ্যে সেগুলি নির্দিষ্ট সব স্টলে নিজে পৌঁছে দিতেন এবং আমাদেরও তাগাদা দিতেন। এক্ষেত্রে তাঁর ধৈর্যও ছিল অসীম। বিধান সরণীর শ্যামবাজারের মুখে এক চশমার দোকানের পাশে পথের ওপর এমনই এক স্টলে আমি গোড়ার দিকে পত্রিকা দিতাম। কয়েকমাস যাবৎ বিক্রেতাটি আমাদের পাওনা দিতে যথেষ্ট বেগ দিচ্ছিলেন। আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। তখন দায়িত্ব নিলেন অশোক নিজে এবং আদায় করে ছাড়লেন। তখন বুঝলাম পত্রিকা চালনা করার জন্য কতখানি শক্তি ও শ্রমদানের প্রয়োজন।

পত্রিকার মান বজার রাখার জন্যও তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। মনে আছে অধ্যাপক অশোক রুদ্র তাঁর 'শিকল ভাঙা সংস্কৃতি' পর্যায়ক্রমে 'উৎসমানুষ' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। অধ্যাপক রুদ্র নিজেই এই পত্রিকায় লিখতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর রচনার পাণ্ডুলিপি অশোক সরাসরি গ্রহণ করলেন না। একদিন সন্ধ্যায় কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলে পুঁটিরামের মিষ্টির দোকানে অধ্যাপক রুদ্র তাঁর প্রবন্ধ নিয়ে অশোক, সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমার সঙ্গে আলোচনা পর্যন্ত করেন। অনেক তর্ক-বিতর্ক শেষে অধ্যাপক রুদ্রর রচনা পত্রিকার মূল ধারাকে বজায় রেখেই ছাপা হল। এই অধ্যাবসায় ও দক্ষতাই অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়কে একজন যথার্থ সম্পাদক হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছিল। আজ 'উৎসমানুষ' আমরা যেমন দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম, তেমনটি নেই। সে দুঃখ আমাদের মত কিছু ভিত তৈরির শ্রমিকের কাছে কোনদিনই মেটবার নয়। তার সঙ্গে যে দুঃখ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াণের মধ্য দিয়ে এল—তার বোঝা কীভাবে বহন করব!

আপসহীনতাই ওকে ব্যতিক্রমী করেছিল

মৈনাক মুখোপাধ্যায়

'What I will leave behind will not be engraved in some stone monuments, but perhaps woven into the lives of my close ones.' — এই বাক্যটি দিয়ে অশোকদা শেষ করতেন তাঁর প্রতিটি ই-মেল। তাঁকে নিয়ে যে এত তাড়াতাড়ি 'স্মৃতিচারণ করতে হবে সেটা কোনোদিন ভাবনায় ছিল না। ১৯৮৩ থেকে ২০০৮ : এই পঁচিশ বছর অশোকদার অনুষঙ্গে ছিলাম, ছিলাম তাঁর যুক্তিবাদী মেধা মননের আশ্রয়ে। নরম-কঠিন, সরল, জটিল, আপাদমস্তক ব্যতিক্রমী, বিচিত্র এই ব্যক্তিত্ব মধ্যযৌবনে আমাকে চমকে দিয়েছিলেন স্মরণীয় তীব্রতায়। আশির দশকের শেষদিকে 'উৎস মানুষ' আন্দোলন আমাদের বিবেক, বিচার আর অনুভূতিকে নাড়িয়ে দিয়েছিল আমূল, উদ্বুদ্ধ করেছিল এক নতুন জীবনাদর্শে।

'সবকিছুতেই খুঁজব কারণ, অন্ধভাবে মানব না, বিজ্ঞানকে বইয়ের পাতায় বন্দী করে রাখব না' — এই বাক্যবন্ধেই অশোকদাকে এক কথায় চিনে নেওয়া যায়। শুধু কারণ খোঁজাই নয়, সেই কারণকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া, কেতাবী বিজ্ঞানের মঞ্চ থেকে নেমে সাধারণ পাঠকের জায়গা থেকে বিভিন্ন বিষয়কে তাঁদের মতো করে দেখা/বোঝা এবং বোঝানো, এটাই ছিল 'উৎস মানুষ' আন্দোলনের লক্ষ্য ; বেশি করে মানুষ বিজ্ঞানমনস্ক হয়, সংস্কারের বেড়াজাল কেটে বেরিয়ে এক স্বাধীন, যুক্তিবাদী, সচেতন মনের অধিকারী হয় এবং দৈনন্দিন জীবনাচরণে যাতে তার প্রতিফলন ঘটে। কাজটা খুব সহজ ছিল না। সেই কঠিন কাজটাকে আমাদের জন্য কী করে সহজ করে তোলা যায়, অশোকদার দিন-রাতের ধ্যানজ্ঞান ছিল সেটাই।

'উৎস মানুষ' প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে গিয়েছিল, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানিকতাকে ভাঙতে চেয়েছিল। স্বভাবতই সে কোনো আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা পায় নি, চায় নি। কারণ, সে আপস চায় নি। ফলে আজীবন ভুগেছে অস্তিত্বের সংকটে। ভালো লেখার অভাব, নিবেদিতপ্রাণ কর্মীর অভাব, সর্বোপরি অর্থের অভাব। শুধু অভাব আর অভাব। এত অভাবের মধ্যেও যে অবিস্মরণীয় ধনাত্মক প্রভাব সে সমাজের ওপর প্রতিষ্ঠা করেছে, তা এককথায় তুলনারহিত।

অশোকদার সবচেয়ে বড় গুণ ছিল, আপস করতে পারতেন না। এটাকেই অনেকে তাঁর সবচেয়ে বড় দোষ মনে করেন। কারণ, আমাদের মধ্যে আজ এই গুণটির অভাবই সবচেয়ে প্রকট। আমাদের শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই নির্বান্ধব পৃথিবীতে, আপসই তোমার একমাত্র অস্ত্র, সেই শিক্ষার কাছে নতজানু হয়ে, আমরা নিয়মিত ব্যক্তি থেকে সমষ্টিতে রূপান্তরিত হচ্ছি, স্বার্থপরতা ছাড়া যে সমষ্টির নিজস্ব কোনো চরিত্র নেই। বড় ভাল হত, যদি আপসহীনতা আমাদের সমষ্টিগত চরিত্র হত।

এই নিঃস্বার্থ নিজস্বতা, এই আপসহীনতা, প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা,

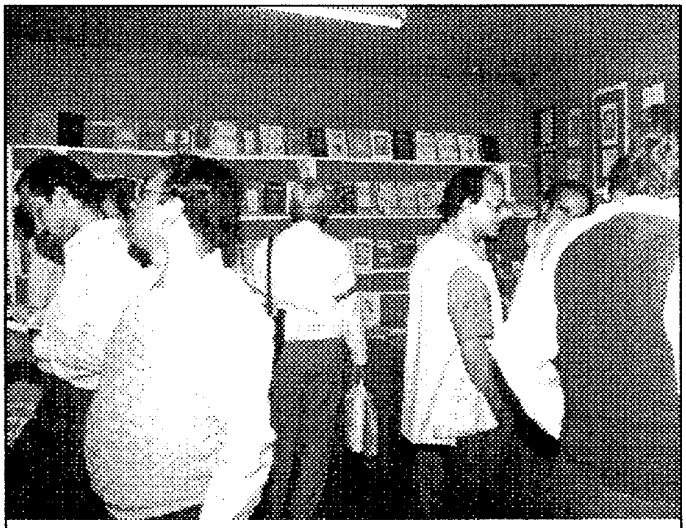

১৯৯৪-এর বইমেলায় উৎস মানুষের স্টলে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতিবাদী মানসিকতা অশোকদাকে আলাদা করে দেয় আমাদের থেকে। স্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়ে দেওয়ার কৃতিত্ব তাঁর, সে স্ফুলিঙ্গ যে দাবানল হয়নি, সে ব্যর্থতা আমাদের। শেষের দশটা বছর অশোকদা হয়ে পড়েছিলেন একা, আমরা পারিনি তাঁর কর্মভার ভাগ করে নিতে, পারিনি মানসিক সাহচর্য দিতে, পারিনি তাঁর জায়গা থেকে সমস্যাকে দেখতে, বুঝতে বা স্পর্শ করতে। তবু যদি কিছু মাত্র প্রেরণা তাঁর থেকে পেয়ে থাকি, এখনও সময় আছে, তাঁর আরব্ধ কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার, 'উৎস মানুষ'কে আবার কিছুটা হলেও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার। আমরা কি আর একবার চেষ্টা করতে পারি না? পারি না কি কিছু টাকা পয়সা জোগাড় করে 'উৎস মানুষ' এর নিঃশেষিত অমূল্য প্রকাশনাগুলো পুনর্মুদ্রণ করতে ; বেশি না হোক, বছরে ২-৩টে বিষয়ভিত্তিক সুসম্পাদিত সংখ্যা প্রকাশ করতে, অশোকদার প্রতিষ্ঠিত নীতির ওপর দাঁড়িয়ে ; বছরে একবার 'আড্ডায়' মিলিত হতে, বইমেলায় জড়ো হতে? তিন দশক ধরে তিলে তিলে গড়ে ওঠা একটা আন্দোলনকে একেবারে হারিয়ে যেতে না দিতে?

অশোকদা যেভাবে যা করতে চেয়েছিলেন, তা কি ভুল? সভ্যতার ইতিহাসের দিকে তাকালে সেটা তো মনে হয় না। তাহলে কি সমস্যাটা অন্যত্র? আকর্ষণ আর বিকর্ষণের সমান ক্ষমতা ছিল বলেই কি এই বিরল, কেন্দ্রাতিগ ব্যক্তিত্ব হৃদরোগের কাঁটাতারে সীমাবদ্ধ হয়ে শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে পারলেন না তাঁর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে, এক উজ্জ্বল, অপরিসীম সম্ভাবনা নিয়ে শুরু করেও? এইসব চিন্তা 'অন্তর্গত রক্তের ভিতরে' নিয়ে, অশোকদাকে স্মরণ করি শ্রদ্ধায়, প্রেমে আর অসহায়তায়।

'উৎস মানুষ' ও তার উৎস মানুষটি

ভবানীপ্রসাদ সাহু

বিশেষ সামাজিক পরিবেশে ও প্রয়োজনে এক একজন মানুষকে বিশেষ দায়িত্ব নিয়ে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে হয়। প্রায় তিরিশ বছর আগে এমনই এক ভূমিকা পালন করেছিলেন সদ্যপ্রয়াত ড. অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু পত্রিকার প্রতিষ্ঠা, সম্পাদনা ও পরিচালনাই নয়, সামগ্রিকভাবে গণবিজ্ঞান আন্দোলনের এক পুরোধা ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছিলেন তিনি। যাঁরা তাঁকে জানতেন, তাঁরা 'উৎস মানুষ'- কেও জানতেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশের এবং তার বাইরেরও, অন্তত বাংলাভাষী বিজ্ঞানমনস্ক ও গণবিজ্ঞান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত যে অসংখ্য মানুষ 'উৎস মানুষ' থেকে নিজেদের চেতনার উত্তরণ ঘটানোর ও আন্দোলনের শক্তি সংগ্রহের চেষ্টা করতেন—তাদের সবার পক্ষে এই পত্রিকা ও সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের পেছনে নিতান্তই আত্মপ্রচারবিমুখ অশোক বন্দোপাধ্যায়ের ভূমিকা তথা নিরন্তর নিরলস শারীরিক-মানসিক প্রশ্ন সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল থাকা সম্ভব ছিল না।

সত্তরের দশক রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক বিশাল আলোড়নের একটি দশক। অশোকের নিজের কথায়, সত্তরের প্রায় মধ্যভাগ থেকে যখন এই দুরন্ত শক্তিশালী সংগ্রাম ভাঙতে থাকে, অন্যায়-অবিচার-অন্ধতা-বিভ্রান্তিমুক্ত একটা সমাজ প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতা থমকে যায়, তখন থেকেই এই ব্যর্থতার কারণ বিশ্লেষণ শুরু হয়, বিকল্প পন্থার সন্ধান শুরু হয় শিক্ষিত সচেতন মহলে। বিজ্ঞানমনস্কতা, সামাজিক মানবিক মূল্যবোধ এবং মানুষের জন্য বিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে, মনন ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এমনই এক অনুসন্ধান শুরু করেন তিনিও, যার ফসল 'মানুষ' ও পরে 'উৎস মানুষ' প্রকাশ। এমন চিন্তাভাবনায় সমৃদ্ধ একটি পত্রিকার প্রয়োজন তখন যে ছিল, তা বোঝা যায় দ্রুত এর জনপ্রিয়তা অর্জন ও প্রসারের মধ্যে।

উৎস মানুষ যা করেছিল বা করতে পেরেছিল, সেগুলিকে এভাবে হয়ত বলা যেতে পারে—

(১) একটি বৈজ্ঞানিক মন তথা বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলা, যে বিজ্ঞানমনস্কতা নিছক বিজ্ঞানের তথ্য জানাও নয় আবার সাধারণভাবে যুক্তিবাদও নয়, যে যুক্তিবাদ আসলে এই বৈজ্ঞানিক মন বা বিজ্ঞানমনস্কতারই ফসল। উৎস মানুষের অসংখ্য লেখাপত্রে দৈনন্দিন জীবনের নানা চমকপ্রদ বা আপাতভাবে রহস্যময় অলৌকিক ঘটনার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সব ঘটনার পেছনেই রয়েছে কোনো প্রাকৃতিক নিয়ম, রয়েছে তার নির্দিষ্ট কারণ—এগুলি জনপ্রিয় ভঙ্গীতে তুলে ধরা হয়।

(২) এরই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, এমন বৈজ্ঞানিক চেতনায় সমৃদ্ধ মননের ওপর ভিত্তি করে বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা, জীবনের ও সমাজের সব কিছুর পেছনে কারণ খোঁজা, যুক্তি ও তথ্যের অনুসন্ধান করা, আপ্ত বাক্য হিসেবে বা অন্ধভাবে কিছু বিশ্বাস না করা—এ ধরনের একটি সার্বিক বোধ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছে 'উৎস মানুষ'। নারী-পুরুষ সম্পর্ক, নাটক-সাহিত্য; খেলাধুলা, রোগ-ব্যাধি, খাওয়া-পরা ইত্যাদি যাবতীয় দৈনন্দিনতায় বিজ্ঞানের ওতপ্রোত সম্পর্কের কথা বলেছে 'উৎস মানুষ'।

(৩) নিছক বৈজ্ঞানিক তথ্য ও প্রযুক্তিসর্বস্বতা কাটিয়ে তুলে বিজ্ঞান কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য প্রতিষ্ঠা করা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নানা তথ্য, কলাকৌশল ইত্যাদি নিয়ে বহু বিজ্ঞান পত্রিকাই আছে। কিন্তু 'উৎস মানুষ' শুধু যান্ত্রিকভাবে তথ্যাদির উপস্থাপনা করেনি, বিজ্ঞান যে একটি চিন্তন পদ্ধতি এবং ভাববাদী চিন্তার বিপরীতে সত্যের অনুসন্ধান করে—এই বোধটি তীব্রভাবে প্রকাশ করেছে 'উৎস মানুষ'। এটি প্রকাশ করেছে 'বিজ্ঞান বইয়ের পাতায় বন্দী' হয়ে থাকার জিনিস নয়, তা একটি জীবনবোধ।

৪) সামাজিক দায়বদ্ধতা তথা মানুষের কাছে দায়বদ্ধতা ছাড়া বিজ্ঞান, বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদরা যে অসম্পূর্ণ বা অর্থহীন এটি সোচ্চারে বলেছে 'উৎস মানুষ'। পরিবেশ, পরমাণু অস্ত্র ও শক্তি, বড়বাঁধ ও ব্যয়বহুল সেচ ব্যবস্থা, ওষুধপত্র ও চিকিৎসা ব্যবস্থা ইত্যাদি অজস্র বিষয়ের সামাজিক-মানবিক দিকগুলি তুলে ধরা হয়েছে পত্রিকার পাতায়, এবং তাই 'উৎস মানুষ' কে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় গড়ে তুলেছিলেন 'বিজ্ঞান সমাজ ও সংস্কৃতির' পত্রিকা ; তিনি বলেছিলেন 'মানুষের জন্য বিজ্ঞান, মানুষকে নিয়ে বিজ্ঞান, মানুষকে দিয়ে বিজ্ঞান'। পত্রিকার পাতায় পাতায় ছিল এই ভাবনারই প্রতিফলন।

(৫) মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তোলা যে বৈজ্ঞানিক মন বা বিজ্ঞানের প্রকৃত তাৎপর্যকে প্রয়োগ করা ছাড়া সম্ভব নয় — তা প্রতিষ্ঠা করা। কোনো মিথ্যা বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস, একটি কল্পিত অলৌকিক অতিপ্রাকৃতিক শক্তির ওপর বিশ্বাস এবং তার ওপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা কৃত্রিম মনুষ্য সৃষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক নানা ধর্মে আস্থা তথা ধর্ম পরিচয়, এসবেও যেমন, তেমনি যান্ত্রিকভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চা করা এবং নিছক পেশার জন্য বিজ্ঞানকে ব্যবহার করা এ সবেও প্রকৃত মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তোলা যায় না। মানুষকে ভালবাসা, মানবিক সহমর্মিতা ও সহযোগিতা ইত্যাদি গড়ে তোলার কাজ যে একজন বিজ্ঞানমনস্ক মানুষই প্রকৃত অর্থে করতে পারেন তা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছে 'উৎস মানুষ'।

(৬) সামগ্রিকভাবে একটি সুস্থ, শোষণমুক্ত ও বৈষম্যহীন সমাজ গড়া যে বৈজ্ঞানিক মন তথা যুক্তিতথ্য, প্রমাণ, কারণ অনুসন্ধান করার মানসিকতা ছাড়া সম্ভব নয় — এটিও প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছে 'উৎস মানুষ'। নারী আন্দোলন থেকে শ্রমিক আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন থেকে সাংস্কৃতিক আন্দোলন — যাবতীয় আন্দোলনের পেছনে যদি অবৈজ্ঞানিক, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অন্ধবিশ্বাসে সম্পৃক্ত মানসিকতা কাজ করে, তবে তা এক সময় ব্যর্থ হতে বা কানাগলির সম্মুখীন হতে বাধ্য। 'উৎস মানুষ' চেষ্টা করেছে এমন নতুন সমাজ গড়ে তোলার এমন কারিগর গড়ে ওঠায় সাহায্য করতে।

সব মিলিয়ে 'উৎস মানুষ' পত্রিকা এবং তার উৎস মানুষ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরো পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তারিত মূল্যায়ন করা দরকার। আগামী দিনে কোনো গবেষক নিশ্চয়ই তা করবেন। এবং এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, সত্তর দশক পরবর্তী প্রায় তিন দশক সময়কাল ধরে, এই পত্রিকা ও অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় অন্তত বঙ্গভাষী পূর্ব ভারতীয় উপমহাদেশের বিজ্ঞান-সমাজ ও সংস্কৃতির আন্দোলনে তথা গণবিজ্ঞান আন্দোলনে যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন, তা কোন গবেষকের পক্ষেই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

সমকালীন সময়ের মুখিয়া সৈনিক

পাচু রায়

আমি উৎস মানুষের তেমন কেউ নই, কেউ হওয়ার যোগ্যতা নেই বলেই। পত্রিকার দশ বছরে মতামত পাঠাবার অনুরোধ নিয়ে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি চিঠি আসে। গোখেল রোডে বেঙ্গল ইনজিনিয়ার্সের অডিটোরিয়ামে সারাদিন যে সভাটি হয় দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে (সম্ভবত ১৯৮৯ সালে) সেটিই উৎস মানুষের আড্ডায় এই অধমের প্রথম হাজিরা। তার আগে থেকেই উৎস মানুষে লিখছি। তখনও অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বা উৎস মানুষের কারোর সঙ্গে আমি আলাপিত হইনি। আলাপটা করিয়ে দেন যুগলদা, যুগলকান্তি রায়। যতদূর মনে পড়ে, সেই আড্ডাটি হয়েছিল শিয়ালদহের নেতাজি সুভাষ ইনসটিট্যুটের মূল সভাকক্ষের বাইরের লম্বা আটচালা ঘরে। যুগলদা অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কি যেন বললেন, আমার নাম ডাকা হল, মিনিট তিনেক হাবিজাবি কি বলেছিলাম। সেটাই প্রথম মোলাকাত অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। এরপর সব আড্ডাতেই যেতাম-তখন অশোকের সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ঠতা না থাকলেও আলাপ ছিল ভালই। অশোক এবং বরুণ ভট্টাচার্যর সঙ্গে কিছুটা ঘনিষ্ঠতা ২০০৫ সাল থেকে উৎস মানুষের ভাঙাহাটের পর্বে পুনরুজ্জীবনের সেই প্রয়াসে। এই যুক্ততার নিরিখে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি দেখব না। আমি তাঁকে দেখতে চাই সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে যখন তাঁকে চিনতাম সমাজসচেতন আন্দোলনের আলোকে প্রচলিত গড় স্রোতের বাইরে দাঁড়িয়ে যুক্তিবাদী আন্দোলনের তাত্ত্বিক ভিত যিনি গড়তে চেয়েছিলেন, সেই আশি-নব্বইয়ের দশকের অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। যাঁর সঙ্গে তখন আমার চাক্ষুস কোনও আলাপ ছিল না। গিমিক নয়, হুল্লোড়বাজি নয়, একদেশদর্শিতায় আক্রান্ত নয়, বিজ্ঞান চেতনাকে বিজ্ঞান শিক্ষার ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে সার্বিক ও ঐতিহাসিক সমাজ চেতনায় জারিত এক যুক্তিবাদী আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব হিসাবে আমি দেখতে চাই অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়কে, যিনি উৎস মানুষ পত্রিকাকে হাতিয়ার করেছিলেন নিজেকে প্রটেক্ট করার জন্য নয়, একটি গভীর অন্যধারার যুক্তিবাদী আন্দোলন নির্মাণের লক্ষ্যে। আমাদের অধিকাংশ কাজকর্ম কলোনিয়াল লিগ্যাসি ও ফিউডাল প্যারোকিয়াল সংকীর্ণতায় আক্রান্ত আজও। এই লিগ্যাসির বাইরে যুক্তিনির্ভর এক আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন অশোক। চেয়েছিলেন একটা মানদণ্ড যা বুর্জোয়া ধারার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে, বুর্জোয়া সমাজনীতি যে মূল্যবোধকে লোপাট করে দিতে চায়, সেই মূল্যবোধকে বাঁচিয়ে রাখবে। একটা সততা যা রাজা বা রানিয়ার কাছে নতজানু হবে না। অশোকের এই দিকগুলি দেখতে হলে তাঁর সঙ্গে আলাপ না হলেও চলে। কেননা উৎস মানুষকে তিনি এক নেছক পত্রিকা হিসাবে চালান নি বা তৈরি করেন নি। এই কাজগুলো করার জন্য, এই কথাগুলো বলার জন্যই অশোকের উৎস মানুষ।

হ্যাঁ, আপত্তি উঠতে পারে বার বার অশোকের উৎস মানুষ বলাতে। কেননা একা অশোক তো সেই সময় পত্রিকাটি চালাতেন না। একটা শক্তসমর্থ্য পরিচালকমণ্ডলী ছিল। কিন্তু এই সুসম্পন্ন পরিচালকমণ্ডলী তাঁদের নেতৃত্বে অশোককেই চেয়েছিলেন। অকপটে বলা যায় বিষয়গুলিকে গুছিয়ে উপস্থাপন করার পরিচ্ছন্ন ক্ষমতার অধিকারী এমন সম্পাদক আর কোথায় পাব এরপর!

ধর্মীয় ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে নাস্তিকতার প্রচারে, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, জ্যোতিষির জালিয়াতির বিরুদ্ধে, খাদ্য নিয়ে নানান সংস্কারের বিরুদ্ধে, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সচেতনতা বাড়াতে ও এ ব্যাপারে নানান দুর্নীতির বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, লিঙ্গ বৈষম্য ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে, মানবাধিকারের সমকালীন এই সময়ের মুখিয়া সৈনিকের নাম অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন উৎস মানুষ। সেই নেতাকে চিতার লাইনে নিমতলা শ্মশানের মেঝেতে নিছক কিছু আত্মীয় বেষ্টিত শুয়ে থাকতে দেখে চকিতে ভেসে উঠেছিল প্রথাগত শিক্ষায় 'অশিক্ষিত' বিদ্যুৎ বর্জিত সুন্দরবনের সরবেরিয়া অঞ্চলের কৃষিচক্রের সেই মহীয়ষী নারীর মুখ, অনুজ অশোক যাঁর কাছে ছিলেন অনুপ্রেরণা, যিনি পুত্র অরুণকে বলেছিলেন, তাঁকে যেন কোনও অবস্থাতেই পোড়ানো না হয়। ওঁর মরদেহ চলেছে এন.আর.এস এর এ্যানাটমি বিভাগের দিকে, পেছনে শোকস্তব্ধ সহস্র মানুষের মিছিল। মনে পড়েছিল! যখন চিতায় পোড়েন এদের সকলের নেতা অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, তখন গুমরে ওঠে এক অসহায় হাহাকার বুকের মাঝখানে।

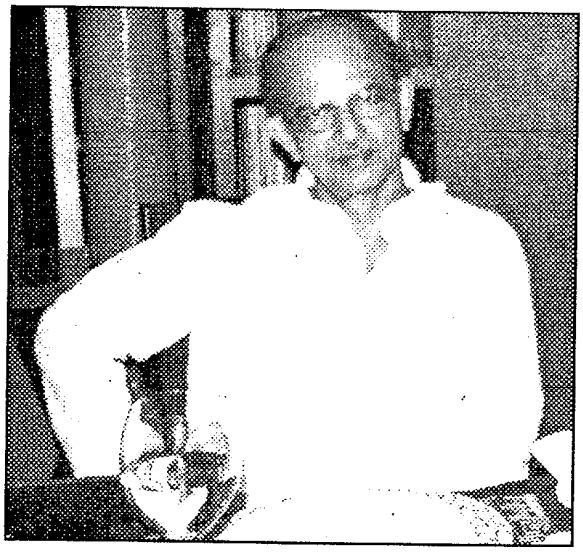

কাজের অবসরে

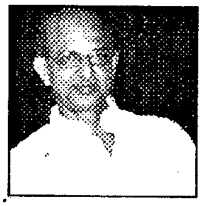

স্কুলের বন্ধু অশোক

উৎপল সান্যাল

ঠিক আটচল্লিশ বছর আগে ১৯৬১ সালের জানুয়ারি মাসে হিন্দুস্কুলের ক্লাস সিক্সের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আমরা একসঙ্গে সিক্স-সি ক্লাসে ভর্তি হই এবং ৬৭ সালে বিজ্ঞান নিয়ে একসঙ্গে পাস করি। প্রথম আলাপের পরই টুকটুকে ফর্সা অশোকের বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল চোখ আর হাসির সঙ্গে ডানগালে টোল পড়া এখনও চোখে ভাসে। কি একটা ঝোঁকের বশে ১৯৬১ সালেই একটি খাতায় কয়েকজন সহপাঠীর লেখা কবিতা/ছড়া আর কিছু গদ্য সংগ্রহ করেছিলাম। কেউ কেউ নিজেই লিখে দিয়েছিল, আবার কারোর লেখা আমি লিখেছিলাম তলায় তার নাম সই করে দিয়েছিল, যেমন করেছিল অশোক ১৭ই আগস্ট তারিখে। কবিতাটি হল এইরকম :

পাগলা বুড়ো

এক যে পাগলা বুড়ো,
রোজ সকালে গ্রীষ্মকালে
দুপুরবেলা খেতো সে যে
রাত্রিবেলা বসে বসে
পথ দিয়ে সে যেতে যেতে
চেয়ে চেয়ে দেখতাম শুধু
আপন মনে ক্ষেপে গিয়ে
পেছন থেকে বসিয়ে দিতাম
একদিন সেই দেখি গিয়ে
পথের মধ্যে ধুলোমাখা

নামটি তাহার ভোম্বল
গায়ে দিত সে কম্বল।
মুড়ি মুড়কি ভাজা
খেতো মূলোভাজা।
করত সে পাগলামি
বন্ধু এবং আমি।
মারতে আসতো ঢিল
দুটো চারটে কিল।
গাড়ি চাপা পড়ে
পড়ে আছে মরে॥

জানি না এর আগে অশোক আর কোথাও লিখেছিল কিনা বা এটি ওর প্রথম লেখা আর প্রথম সই কিনা। পরবর্তীকালে যে বহু লেখা লিখবে তার স্ফূরণ কিন্তু ওর স্কুল থেকেই শুরু হয়েছিল। বিভিন্ন বিষয়ের ওপরে সে সময়ই অশোক চমৎকার লিখতে পারত। অশোক বরাবরই মেধাবী ছাত্র ছিল। তিনটি সেকশনে মিলিয়ে আমরা একসঙ্গে সেভেন 'এ'র এলিট সেকশনে ভর্তি হলাম। ঐ সময় রবীন্দ্রনাথের 'বীরপুরুষ' নাটক করার কথা ছিল, যাতে অশোকের মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করার কথা ছিল। অবশ্য শেষ অবধি কয়েকদিন মহড়ার পর নাটকটি হয়ে ওঠেনি। ক্লাস নাইন থেকে আমরা একসঙ্গে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হলাম। সে সময় থেকেই ওর ফিজিক্সে আগ্রহ লক্ষ্য করেছিলাম। পড়াশোনার পাশাপাশি অশোক খেলাতেও উৎসাহী ছিল। ফুটবল খেলেছে, হকি স্টিক হাতেও ওকে দেখা গেছে। মনে পড়ে ইলেভেনে পড়ার শেষ দিকে ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বরে ব্যান্ডেলে পিকনিক করার কথা। হায়ার সেকেন্ডারি পাস করার পর ফিজিক্স অনার্স নিয়ে অশোক মৌলানা আজাদ কলেজে ভর্তি হল আর কেমিস্ট্রি অনার্স নিয়ে আমি সেন্ট জেভিয়ার্সে গেলাম।

স্কুল পরবর্তী জীবনে আমাদের দুজনের বিষয় আলাদা হওয়ায় এবং যে যার মতো করে জীবনযুদ্ধে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় সাময়িকভাবে আমাদের যোগাযোগ কমে গেল। এছাড়া এখনকার মতো মোবাইলে কথা বলার এত সহজ উপায়ও তখন ছিল না। কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়ায় এবং বইমেলার সময় দেখা হত আর নানা বিষয়ে আলোচনা হত। এর পর ১৯৯৬ সাল নাগাদ হিন্দু স্কুলেরই সহপাঠী সুজিত আর কমলের সঙ্গে 'উৎসুক' হয়ে ঠিক করা হল ১৯৯৬ সালের ১লা মে হিন্দুস্কুলেই আমাদের ব্যাচের রি-ইউনিয়ন করা হবে। ঠিক করলাম, যাদের সঙ্গেই যোগাযোগ আছে বা হবে তাদের কাছে এক পাতার মধ্যে তার যোগাযোগের ঠিকানা, পরিবার পরিজনের খবরাখবর, অবসর কীভাবে কাটায়, ভবিষ্যতের ভাবনা ইত্যাদি বন্ধুদের নিজের হাতে লেখা সংগ্রহ করে একটি বইতে সংকলন করা হবে। সেইমতো ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬র এক সন্ধ্যায় অশোক তখন যেখানে থাকত, সেই বিধান আবাসনের ফ্ল্যাটে চলে গেলাম। অশোকও উৎসাহের সঙ্গে 'উৎসুকের' এই প্রয়াসে সমর্থন দিল এবং নিজের হাতে লেখাটি দিল যা এখানে সংযোজিত হল। (পরের পাতায়)

"উৎস মানুষকে" বাদ দিয়ে অশোককে কল্পনা করা কঠিন। বইমেলায় গেলেই 'উৎস মানুষের' স্টলে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করাটা এখন প্রায় বাৎসরিক ব্যাপার ছিল অন্তত যতদিন বইমেলা ময়দানে ছিল। প্রায় এক দশক ধরেই ক্যানসার ও মৃত্যুদূত তামাক সম্পর্কিত আমার বেশ কিছু লেখা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে। অশোক মন দিয়ে খুঁটিয়ে পড়ত এবং ফোন করে সে সম্বন্ধে মতামত দিত। ও ঠিক করেছিল, এই দুটি বিষয়ের ওপরেই আমার লেখা 'উৎস মানুষে' প্রকাশ করবে। সেই মতো সেপ্টেম্বর ২০০৮ এ তামাক সম্পর্কিত ওর নিজের অনবদ্য সংযোজন সহ লেখাটি ছাপায়। বিভিন্ন বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যাপারে ওর বিশেষ ভূমিকা ও অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বিরুদ্ধে ওর যুদ্ধ সর্বজনবিদিত। এই লেখাটি লিখতে গিয়ে দেখেছিলাম ও কীভাবে ওর নির্বাচিত বিষয়ের একেবারে ভেতরে ঢুকে গিয়ে, ব্যাপারটি নিজে বুঝে নিয়ে তারপর লেখাটি ছাপায়। অভিভূত হয়ে দেখেছিলাম লেখাটিতে কতকগুলি টেকনিক্যাল ব্যাপার ছিল যা অন্য কোথাও ছাপা হয়নি—ও নিজে থেকে সেগুলি ছাপানোর ব্যবস্থা করে।

অশোকের সম্বন্ধে এই স্মৃতিচারণ লিখতে গিয়ে মনে হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের সেই অনবদ্য পঙ্‌ক্তিগুলি

"সিন্দুকে রহে বন্ধ
হঠাৎ খুলিলে আভাসেতে পাও
পুরোনো কালের গন্ধ।"

উৎসুক-এ পাঠানো অশোকের সেই সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয়

□ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়
বিধান আবাসন, ফ্ল্যাট বি ১০/৮
সল্ট লেক / কলকাতা ৭০০০৯১
বাড়ীর ফোন ৮২১৪৭৭১ ॥ অফিস ফোন ৫৫০-৭৪৮৯

□ বার চোদ্দেক চাকরি পাল্টে এখন, অনেকদিন হল, রাজ্য ফরেনসিক সাইন্স লেবরেটরি, বেলগাছিয়া-তে আছি। বৌ আর বাচ্চা মেয়ে নিয়ে ছোট্ট পরিবার, 'সুখী' কিনা জানি না, বুঝতে পারি না।

□ অবসর খুঁজে পাওয়াই মুশকিল হয়। ২৪ ঘন্টা বড্ড ইনসাফিসিয়েন্ট লাগে। অফিসের বাইরের কাজেই চাপ বেশি। 'উৎসমানুষ' পত্রিকা নিয়ে ডুবে থাকি আর বিজ্ঞানচেতনার আন্দোলনের সাথে কম-বেশী জড়িয়ে থাকার চেষ্টা করি। কবিতা পড়ি না।

□ ভবিষ্যৎ ভাবনা? ...অনেক। বন্ধুত্ব নিয়ে অনেক স্বপ্নও দেখি আজকাল। যদি সেই স্কুলের দিনগুলো এখন আবার ফিরে পেতাম, কেমন হ'ত? সেই রাগ-অভিমান, সরল বিশ্বাস, সেই দল বাঁধা, বন্ধুর জন্য মন খারাপ....। সেসব আর ফিরে আসেনা কিছুই তবু স্বপ্নটা দেখে ফেলি যখন-তখন — এই প্রায়-মধ্য বয়সে, আর্থিক আর সামাজিক প্রতিষ্ঠার মাপজোকে জর্জরিত হয়ে, একটু নির্মল নিঃশ্বাস নিতে ইচ্ছে করে যখন, যখন একটু বেহিসাবি নিষ্কলঙ্ক সময় আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে, তখনই ওই স্বপ্নগুলো ঝিলিক দিয়ে যায়। থাকে না যদিও, আবার অন্ধকারে হারিয়ে যায় আবার অবধারিতভাবেই।
তবু সেই নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত হতে ভালো লাগে। কত পথ তো পার হওয়া গেল, স্কুল জীবনের সেই নির্মলতা আর কই? সবই তো দূষিত এখন!!

ও আমার সোনা বন্ধুরে

বরুণ ভট্টাচার্য

মারা যাবার কদিন আগের কথা। বি এম বিড়লা হাসপাতালে অশোকদা তখনও ভেন্টিলেশনে। শরীরের সব যন্ত্রই প্রায় বিকল। ওই অবস্থাতেও সম্পূর্ণ চেতনারহিত নয়। মাঝে মাঝে অদ্ভুত সব কাণ্ড করছে। যেমন ঐদিন করল। আমি যাওয়া মাত্র অশোকদার স্ত্রী মিত্রাদি হাতে একটা চিরকুট দিয়ে বলল, 'দেখতো তোর অশোকদা কী লিখেছে বুঝিস্ কিনা?' ছোট্ট কাগজে লেখা প্রথম অক্ষর ইংরাজিতে 'বি' উল্টোভাবে, পরেরটা বাংলার 'র', ফুটকিটা একটু পাশে সরে গেছে। শেষের অক্ষরটা মুর্ধণ্য না দন্ত্য ন অনেক নীচে না ওপরে তা বোঝার দরকার হয়নি। মিত্রাদি ওর কাছে যাবার জন্য বললে আর না গিয়ে থাকতে পারিনি। অশোকদাকে ও অবস্থায় দেখা! এটা বুঝেছি, শিখেছি প্রিয়জনের উদ্বেগ ও মানসিক চাপে রোগীর অসুস্থতা বেড়ে যায়। তাই নিজেকে সরিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা।

২০০৭-এর ডিসেম্বর। একদিন অশোকদার সঙ্গে দেখা করতে গেছি। যেখানে দাঁড়াবার কথা তার কাছাকাছি গিয়েই ফোন করলাম। ফোন ধরল ওদের গাড়ীর চালক। কী ব্যাপার জিগ্যেস করার আগেই অশোকদাকে দেখতে পেয়ে গেলাম। একটা দোকানে কোনোরকমে মাথা নিচু করে বসে, দরদর করে ঘামছে। চোখমুখ টকটকে লাল। আমাকে দেখেই মোবাইলটা এগিয়ে দিয়ে ডাক্তারকে ফোন করতে বলল। অসম্ভব হাপাচ্ছিল। জিভের তলায় ট্যাবলেট দিয়ে সোজা বাড়িতে নিয়ে গেলাম। ডাক্তার এসে সে যাত্রা সামলে দিলেন, এটাও বলে দিলেন 'এরপর কিছু হলে হাতের বাইরে চলে যাবে।' এই সাবধানবাণী বিশ্বাস করতে চাইনি। অশোকদা চলে যাবে তা কি আদৌ সম্ভব? হয়ত এমনই হয় কারো কারো।

বহু ঘটনা মনে পড়ছে। ২০০৭ এর পুজোয় উত্তর সিকিমে বেড়াতে গেলাম। আমরা দু'জন টানা প্রায় ৭/৮ দিন একই ঘরে পাশাপাশি শুয়ে বসে বেড়িয়ে আড্ডা মেরে মহা আনন্দে কাটালাম। অশোকদার সঙ্গে যেখানেই বেড়াতে গেছি দেখেছি হোটেলের ঘরে ঢুকেই ওর প্রথম কাজ ছিল বাথরুমটা দেখা, তারপর সোজা বারান্দায়। সন্ধে হলেই বারান্দায় বসে আকাশের দিকে চেয়ে থাকত। রাতের আকাশের দিকে চেয়ে থাকা ও মাঝে মাঝে সহজাত ভঙ্গিতে কথা বলা, এ জিনিস ডুয়ার্সে ও শান্তিনিকেতনে বেড়াতে গিয়েও দেখেছি। ভীষণ প্রিয় ছিল জঙ্গল। সিকিমে বরফের মধ্যে ঐ উচ্চতায় ওকে এতটুকু অসুস্থ হতে দেখিনি। ওর প্রতিটি ভাললাগার ও খারাপ লাগার অভিব্যক্তি আমার সিলেবাসের মধ্যেই ছিল। গত দু-তিন বছর মাঝে মধ্যেই উৎস মানুষের সভায় বেশ ঝাঁঝালো কথা বলত। আমি পরে সুযোগ মতো বলতাম, শোনো তুমি যে লোকজনকে খিস্তি করছ এটা কি ভাল হচ্ছে? একে তো তোমার ছিদ্রান্বেষণে অনেকেই ব্যস্ত, তাদের আর কেন লোপ্পা ক্যাচ দিচ্ছ? চুপ করে যেত। পরে আমাকে যা খুশি বলো, তাতে সেফটি ভ্যালভ রিলিজ হবে আর ভুল বোঝাবুঝিও হবে না। ও এসব বোঝার লোক ছিল না। বলে উঠত না কিরে এটুকু বলা না গেলে উৎস মানুষ করব কেন? আমি কি রাস্তার লোককে গাল দিচ্ছি? কে বোঝাবে ওকে! এরকম অজস্র ঘটনা পাতার পর পাতা লেখা যায়। শহুরে বিজ্ঞানচর্চা, বক্তৃতাবাজি, সভা সমিতি এসবে যেতে বললে রীতিমতো ক্ষেপে যেত। মাঝে মাঝেই বিদ্যাসাগরের সব ছেড়ে-ছুড়ে কারমাটার চলে যাবার কথাটা মনে করিয়ে দিত। ভাল লাগার জায়গা বলতে ছিল ক্যানিংয়ে বিজনদের ওখানে, রানাঘাটে আনুলিয়াতে কুনাল লামা, পূরবী ঘোষদের নীহারিকা। প্রতি বছরই হরিণঘাটার নিরঞ্জন বিশ্বাসদের গ্রামীণ ক্রীড়া উৎসবে যেতে চাইত। আমি অনেক কষ্টে কবার আটকেছি ওর শরীরের ক্ষতি হবে ভেবে নিজের কাজের অজুহাত দিয়ে। অশোকদা লেগে থাকত। 'বরুণ তুই চ, না গেলে যাব না'। ছেলেমানুষি আর কাকে বলে! অ্যাকাডেমি রবীন্দ্রসদনে নাটক দেখতে যেত না। কিন্তু হঠাৎ করে খড়দায় পৃথ্বীশদের খারিজ নাট্য সংস্থার 'গাছ' দেখতে চলে গেল। সঙ্গী আমি ও চেতনার গৌতম। গত দুর্গাপুজোর নবমীর দিন ও আর আমি রানাঘাট যাচ্ছি। ট্রেনে ঢুলছে। 'কি গো রাতে ঘুমোয়নি।' সুন্দরবনে একটা বাঘের পচাগলা দেহ পাওয়া গেছে। জেলাশাসক, টাইগার প্রজেক্টের অধিকর্তা প্রায় রাত আড়াইটে পর্যন্ত সমানে ফোন করে গেছেন, যাতে পরদিন আমি গিয়ে একটা রির্পোট দিই। 'আমিও বলে দিয়েছি যেতে পারব না, অন্য জায়গায় যাবার কথা হয়ে আছে বন্ধুর সঙ্গে, সেটা বাতিল করা সম্ভব নয়।'

ছোট বিষয়, সাধারণ মানুষ নিয়ে ওর আগ্রহ ছিল অপরিসীম। হরিপদ পাল এমনই এক মানুষ—আপাদমস্তক মানবিক, ঘোর যুক্তিবাদী। সম্পূর্ণ একক প্রচেষ্টায় ভদ্রলোক কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের করেন। পেশা পুরানো জামাকাপড় সেলাই আর দোকানের বাকি অংশে সাইকেল জমা রাখা। অশোকদাকে খোঁজ দিতেই লুফে নিল। উৎস মানুষে সাক্ষাৎকারভিত্তিক লেখা ছাপা হল। আবার বই বাঁধাই ও সংরক্ষণ নিয়ে নানান কথা। গণেশ দাসের অভিজ্ঞতা পত্রিকার পাতায় উঠে এল। হঠাৎ একদিন উত্তমকুমার প্রসঙ্গ উঠল। আমি টালিগঞ্জ পাড়ার একজনের মুখে উত্তমকুমারের মানবিক গুণ, স্টুডিওর কলাকুশলীদের বিপদে আপদে শুধু নয়, নিয়মিত তাঁদের সাহায্যে এগিয়ে আসার কথা শুনেছিলাম। অশোকদাকে বলতে ব্যঙ্গ তো করলই না বরং বলল, ঘটনার সত্যতা যাচাই করা গেলে উৎস মানুষ তা ছাপাবে। আসলে মানবিক দিকটা ওকে বেশি টানত, তাই ফিল্মি হিরোর গ্ল্যামারের আঁচে পত্রিকার ইমেজ কতটা পুড়বে তার পরোয়াই করল না। আটামাখা থেকে শুরু করে আগুনে রুটি ফুলে উঠছে বা গরম ইস্ত্রি চালিয়ে জামাকাপড় টানটান হয়ে যাচ্ছে কেন, সুতোয় মাঞ্জা দিয়ে ঘুড়ি উড়ছে এসবের মধ্যে যে বিজ্ঞান তা উৎস মানুষের বিষয় হতে পারে এরকম একটা কথা উঠলে সোজা বলে বসল 'তাবড় অধ্যাপককে বলে দেখ না, সহজে এসব লেখার লোক খুঁজে পাবি না। ওসব পাগলামো ছাড়!' সোজা কথা সোজা ভাবে বলাটা ওর অনেক দোষের মধ্যে একটি। সেই সঙ্গে সরাসরি কেউ ওকে কিছু বলুক মনে প্রাণে তাই চাইত। উৎস মানুষকে কেউ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করলে অসম্ভব ক্ষেপে

উঠত। সে যে কেউ হোক। পত্রিকার পাতায় যখন নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুর নিয়ে নানান লেখা বেরোল অনেকেই বলেছিল, অশোকবাবু এসব কী করছেন! উৎস মানুষ বিজ্ঞানটিজ্ঞান ছেড়ে শেষ পর্যন্ত ন্যানো ধরলেন? ওর জবাব ছিল স্পষ্ট, মনে রাখবেন, উৎস মানুষ বিজ্ঞান, সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে লেখা ছাপবে বলে অঙ্গীকারবদ্ধ। অফিসের গাড়ি ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা, ও এক অপরাধ বলে মনে করত। সেটা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলত। টুকরো টুকরো স্মৃতি। পুজোর সময় হিন্দি ফিল্মি গান বাংলা ব্যান্ডের গানের সিডির পাশাপাশি 'মহিষাসুরমর্দিনীর' সিডিও বিকোচ্ছে। অশোকদাকে বললাম, দেখো, ভাল জিনিসের চাহিদা কমে না। অশোকদা আকাশবাণীতে ছিল। বলে উঠল 'জানিস্, আমার বড় সাধ ছিল উৎস মানুষ ওরকমই কালজয়ী হবে'।

বি এম বিড়লাতে ওর কেবিনে গিয়ে দেখি হাতের আঙুলে ছুঁচ ফোটানো, মুখের মধ্যে রবারের পাইপ, সর্বাঙ্গে নানান যন্ত্র। দুপায়ে ক্রেপ ব্যান্ডেজ। যন্ত্রচলার শব্দ গোটা কেবিনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। নার্স ইনজেকশন তৈরি করছে। কাছে ডেকে অনেক কিছু বলার চেষ্টা করল অশোকদা। শুধুই ঠোঁট নড়ছে। শব্দহীন কথা। বুঝলাম ও জানতে চাইছে কে কে এসেছে ওকে দেখতে—আমি গড়গড় করে অনেকের নাম বলে গেলাম। এমন কিছু নাম করলাম যাদের ও পছন্দ করে। তারা কিন্তু হাসপাতালে আসেনি বা আসতে পারেনি। খুব জোরে ঘাড় নাড়ল। পরক্ষণেই আবার যন্ত্রণা। বুকে হাত দেখিয়ে বোঝাল কত যন্ত্রণা। এভাবে কিছুক্ষণ থাকার পর হঠাৎ এক হেঁচকি। গ্লাস রক্ত ভরে গেল। নার্স বলল অকাল্ট ব্লাড। হাতে হাত দিয়ে চলে আসছি, হাত চেপে ধরল। বেশ কিছুক্ষণ ওভাবেই ধরেছিল। আস্তে আস্তে মুঠো শিথিল হল ও আবার চলে গেল গভীর ঘুমের মধ্যে। ওর প্রাণহীন দেহ নিয়ে গাড়ি চলেছে মাঝরাতের অন্ধকার ভেদ করে। এক মহিলা সাংবাদিক ফোন করলেন 'কিছু বলুন ওঁকে নিয়ে'। কী বললাম মনে নেই। শুধু এটুকুই মনে আছে, ওকে মাটির কাছাকাছিই রাখতে চেষ্টা করেছিলাম।

হারালাম অকালে, অসময়ে

ভূপতি চক্রবর্তী

প্রথম আলাপটা ঠিক কবে ও কীভাবে তা মনে পড়ে না। সম্ভবত উনিশশো আশির দশকের গোড়ার দিকে। একেবারেই দাবি করব না, প্রথম আলাপেই সদ্য প্রকাশিত উৎস মানুষ সম্পর্কে উৎসাহী হয়ে উঠি, কিংবা অশোকের সঙ্গে জানাশোনাটা গভীর হতে শুরু করে।

কয়েকটা বছর কেটে যায়। নিয়মিত না হলেও পত্রিকাটা মোটামুটি দেখি। লেখাগুলির বৈশিষ্ট্যের দিকে বিশেষভাবে নজর রাখি। আশির দশকের মাঝামাঝি কিংবা তার কিছু পরে আমার মনে হয় লেখাপত্তর খানিকটা একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছে। কিছু পরিবর্তন হলে মন্দ হয় না। অশোকের সঙ্গে যোগাযোগ করে কথা বললে কেমন হয় ভাবতে লাগলাম।

আর ভাবতে ভাবতে একটা ছোট্ট লেখা লিখে সরাসরি ওর মুখোমুখি হলাম। আমার বক্তব্যটা ছিল, লেখাগুলির মধ্যে প্রচুর মতামত দেওয়া হচ্ছে। বিতর্ক উঠে আসছে, আলোচনা হচ্ছে কিন্তু তথ্য ও বিষয়গত বৈচিত্র্যের অভাব। বিজ্ঞান পত্রিকায়, 'উৎস মানুষ'কে অবশ্যই সেই অভিধায় ভূষিত করা যায়, তথ্যভিত্তিক লেখা চাই।

অশোক আমার কথা মেনে নিয়েছিল কিনা জানি না কিন্তু বলেছিল, যে ধরনের লেখার কথা বলছ, তার জন্য উৎস মানুষের দরজা খোলা। লিখে দাও না। বিজ্ঞানের তথ্যভিত্তিক লেখাকে সামাজিক চালচিত্র সহ উপস্থাপনার বিষয়ে কিছু মূল্যবান পরামর্শ অশোকের কাছ থেকে সেই সময় পেয়েছিলাম। সেই পরামর্শ আজও মনে রেখেছি ও কাজে লাগানোর চেষ্টা করে চলেছি।

আশির দশকের শেষের দিকে বুঝলাম—হয়ত অশোকও বুঝতে পারল, আমরা একটা বন্ধুত্বের বন্ধনে জড়িয়ে পড়ছি। তাই আলোচনা বা আড্ডায় কেবল উৎস মানুষ বা তার লেখাপত্তর নয়, উঠে আসত আরও বহু বিষয়। খুব সিরিয়াস বিষয় থেকে যেরকম সহজে ব্যাপারটা ইয়ার্কিতে গিয়ে আবার সিরিয়াস প্রসঙ্গে অশোক ফিরে আসতে পারত, তা ছিল রীতিমত শিক্ষনীয়। এই সময়ই লক্ষ্য করি, চিন্তাকে ভাষায় রূপ দিয়ে চমৎকারভাবে উপস্থাপনার এক অবিশ্বাস্য ক্ষমতার অধিকারী ছিল অশোক। কী বলায়, কী লেখায় এই ক্ষমতার পরিস্ফুটন ঘটেছে বার বার। আমার সব লেখা অশোক ছাপেনি বা ছাপতে পারেনি। চমৎকার মন্তব্যসহ সম্পাদকীয়, পরামর্শ দিয়ে লেখা ফেরত পাঠিয়েছে। চেষ্টা করেছি পরিমার্জন করার, তবে সর্বদা সফল হইনি। অশোকের মন্তব্য সর্বদাই ছিল ভারী স্পষ্ট। চাহিদা ছিল পরিষ্কার। একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে কত বিরল গুণ এটি।

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিষয়গুলিকে সামাজিক পটভূমিকায় দেখা, বিজ্ঞানের সামাজিক প্রয়োগ, বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলার জন্য প্রয়াস তথা আন্দোলন কিংবা গণবিজ্ঞান আন্দোলন প্রভৃতি যে বিষয়গুলি আজ আমাদের অতি পরিচিত বলে মনে হয় সেগুলিকে জনমানসে তুলে আনার পেছনে উৎস মানুষের দিকদর্শী ভূমিকার কথা ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। আর এইরকম একটা বড় কাজের পেছনে সাধারণত একটা মুখ্য গোষ্ঠী এবং তাকে ঘিরে আরও কিছু সমমনস্ক মানুষের অবদান থাকে। উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য এক থাকলেও ব্যক্তি হিসেবে আমাদের মতামত ভিন্ন হয়। পথের দিশা নিয়েও থাকে না চিন্তা। কিন্তু এই ধরনের অজস্র 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' স্থাপনের জন্য যে নেতৃত্ব প্রয়োজন তা দেওয়ার ক্ষমতা অশোকের ছিল। অবশ্যই তার সঙ্গেই ছিলেন আরও কিছু বন্ধুস্থানীয় সহকর্মী। এই সবকিছু নিয়েই উৎস মানুষ এগিয়ে এসেছিল। আর একটা পত্রিকা কীভাবে কিছু মানুষের কেবল কণ্ঠস্বর নয়, একেবারে মানসিক বল জোগানোর হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে তা উৎস মানুষকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ না করলে হয়ত বুঝতে পারতাম না। বয়সে আমার থেকে সামান্য বড় ছিল অশোক। তিক্ষ্ণধী প্রাণবন্ত ব্যক্তিত্বটির পরিচয় কেবল উৎস মানুষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষেরা পাননি—তা ছড়িয়ে গেছে বহুদূর। ক্যানিং থেকে রানাঘাট কিংবা আরো দূরে থেকেও বহু মানুষ উপলব্ধি করেছেন তাঁর হৃদয়ের উষ্ণতা।

আক্ষেপ এই যে, সেই হৃদয়টি বড্ড তাড়াতাড়ি তার কাজ বন্ধ করে দিল। আমরা অশোককে হারালাম বড়ই অকালে, অসময়ে।